বেইজ্জতী

শুজা রশীদ

আরিফের বিশেষ একটা পরিবর্তন হয়নি। সেই একইরকম উষ্কখুষ্ক চুল, চোখে পুরু চশমা, পরনে জিনস এবং হাত কাটা টি-শার্ট। পনের বছর পর দেখা, কিছু বেশীও হতে পারে। ঢাকা থেকে কানাডায় পাড়ি জমানোর পর বার তিনেক দেশে গেছে সৌরভ কিন্তু আরিফের সাথে দেখা হয়ে ওঠে নি। হয় সে নিজে সময় করতে পারে নি, নয়ত ব্যস্ত বাগিশ আরিফের নাগালই পাওয়া যায়নি। এবার সে টরন্টো আসছে শুনে লাফিয়ে উঠেছিল সৌরভ। ইউনিভার্সিটীতে থাকতে ডর্মে রুমমেট ছিল, একশ' একটা স্মৃতি আছে, দু'জনে এতকাল পর আবার সেগুলো একটু চর্চা করা যাবে ভেবে ভালই লেগেছে। পুরানো দিনের বন্ধুদের কয়েকজন এই শহরেও জুটে পড়েছে। সবাইকে জড় করে বেশ একটা পার্টি ফার্টি দেয়া যাবে।

আরিফ সৌরভকে দেখে দু মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। প্লেন থেকে নেমে, লাগেজ কব্জা করে মাত্র কয়েক পা এগিয়েছিল সে। "কি রে, তোর চুল ফুল গেল কই?" তার কন্ঠে বিস্ময়।

নিজের চান্দিতে হাত বোলাল সৌরভ। "শীতের ঠ্যালায় বাপ বাপ বলে খসে পড়েছে! তুই শালা তো একেবারেই পাল্টাস নি। সেই বাবা ভোলানাথই আছিস!"

দু'জনে হাঁ হাঁ করে হেসে কোলাকুলি করে। গাড়ী নিয়ে এসেছিল সৌরভ। মিনিট দশেকের মধ্যেই রাস্তায় নামল। "আছিস কেমন? বহুদিন পর দেখা হল," আরিফ বলল।

"পনের বছর তো হবেই," সৌরভ অকারণে হাসল। "আছি ভালো। ঠান্ডাটা বেশী কিন্তু সয়ে গেছে। একটু সর্দি কাশিতে ভুগি, এই আরকি। তোর কথা বল।"

কিছুক্ষন পারিবারিক, সাংসারিক আলাপ হল। দু'জনাই সংসারী, দু'টি করে বাচ্চা আছে।

"বউ বাচ্চাদের নিয়েই আসতিস," সৌরভ এক পর্যায়ে বলে। "নায়েগ্রা ফলস দেখে যেতে পারত।"

মুচকি হাসল আরিফ। "মাত্র দু'দিনের জন্য এসেছিরে। দেশে অনেক কাজ। একশ গন্ডা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়েছি। বউ বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় নেই।"

"তুই এমন সমাজসেবী হয়ে গেলি কি করে তাই ভাবি," সৌরভ তার বিস্ময় ঢাকার চেষ্টা করে না।

“মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখতে দেখতে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে,” আরিফ গম্ভীর কন্ঠে বলে। “এক শ্রেণীর মানুষ অর্থ, বিত্ত আর ক্ষমতার উপর বসে আছে, আরেক দল বেঁচে থাকার জন্য যুঝে চলেছে। অতিরিক্ত বৈষম্য।”

আড় চোখে বন্ধুকে দেখে সৌরভ। “তোর এন।জি।ও মূলত কি ধরনের কাজ করে?”

“শিক্ষা, চিকিৎসা। দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে কত মানুষ যে সর্বশ্ব খোয়ায়, না দেখলে বিশ্বাস করবি না।” আরিফ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল। “আমার মত অনেকেই চেষ্টা করছে কিন্তু টাকা পয়সার অভাব। চারদিকে এতো কোটি কোটি টাকার ছড়াছড়ি কিন্তু একটা ফ্রি হাসপাতাল করবার জন্য টাকা তুলতে গিয়ে নাভিশ্বাস বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার গ্রামের বাড়ীতে পঞ্চাশ বেডের একটা হাস্পাতালের ভিত করেছি। আমার নিজের জমিতেই। বলতে পারিস সেই জন্যেই টরন্টো তে আসা। ডোনারদের একটা কন্সর্টিয়ামের সাথে ভাগ্যবশতঃ যোগাযোগ হয়ে গেল। কাল দুপুরে তাদের একটা প্রাইভেট পার্টি আছে। অনেক কষ্টে একটা পাস পেয়েছি। আমার প্রজেক্টটা তাদের সামনে তুলে ধরতে পারলে নির্ঘাত মোটা অংকের ডোনেশন পাওয়া যাবে।”

সৌরভ সমঝদারের মত মাথা দোলাল। “মানুষের সেবা করছিস। ভালো। আমি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।”

বন্ধুর পিঠে আলতো করে চাপড় দিল আরিফ। “সমাজ সেবা করবার জন্য ধনী হতে হয় না রে। ইচ্ছাটাই বড়।”

সৌরভের স্ত্রী শিল্পী আরিফের নাম শুনেছে কিন্তু আগে কখন দেখেনি। দু’জনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা সে শুনেছে। আরিফ আলাপী মানুষ। তাকে অপছন্দ হবার কোন কারণ নেই। স্বামীর অনুরোধে প্রচুর রান্নাবান্না করেছিল সে। আরিফ খুব সামান্যই খায়। সৌরভ প্রচুর আনন্দ নিয়ে উদর পূর্তি করে খেল। তার উদর ইদানিং যথেষ্ট স্ফীত হয়ে উঠেছে। শিল্পীর অনুযোগে কান দেয় না সৌরভ। মাঝ বয়েসে এসে সে যেন হঠাৎ করেই নিজের প্রতি মনযোগ হারিয়ে গেছে। জীবনের সাধারণ কিছু বিলাসিতায় সে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। শিল্পীর মাঝে মাঝে মনে হয়, সৌরভ হয়ত উদ্দ্যেশ্যহীনতায় ভুগছে। সে অফিসে যায় আসে, টেলিভিশন দেখে, খায় দায় – প্রায় গত বাঁধা রুটিন। উইক এন্ডে কোন পার্টি থাকলে কিছু আড্ডা হয়, আরোও খাওয়া দাওয়া হয়।

ডিনারের পর লিভিং রুমে ওরা তিন জনে আড্ডা দিতে বসে। বাচ্চারা বিছানায় চলে গেছে। এটাই শিল্পীর ফ্রি টাইম।

আরিফ তার প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে। তার চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। “ভাবী, এখনও কত মহিলারা আছে যারা প্রসবকালে জটিলতার শিকার হয়ে মারা যায়। হাতুড়ে ডাক্তারেরা ভুল চিকিৎসা করে ভালোর চেয়ে মন্দই করে। যদি গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট হাসপাতাল করা যায়

এবং একজন করে হলেও ডাক্তার রাখা যায় কত গরীব মানুষ চিকিৎসা পাবে, নতুন জীবন পাবে চিন্তা করতে পারেন!”

তার কথা শুনতে শিল্পীর ভালো লাগছিল। সৌরভ আনমনা ভঙ্গীতে বন্ধুর কথা শুনছিল। “ডোনারদের কাছে গিয়ে কি বলিস? কেন তারা তোকে ফান্ডিং দেবে? নিশ্চয় ইনিয়ে বিনিয়ে দারিদ্র নিয়ে অনেক প্যাঁচাল পাড়িস?”

শ্রাগ করল আরিফ। “সাহায্য পাবার জন্য যা করতে হয় আমি করি। মাঝে মাঝে খারাপ লাগে, নিজেকে একটু বেহায়া মনে হয়, কিন্তু মনকে বোঝাই, এর কোন কিছুই আমার নিজের জন্য নয়। এটা একটা ভিন্ন ধরণের পরিতৃপ্তি। আয় না আমার সাথে কালকে, দেখবি কিভাবে সবাইকে বাক হারা করে দেব। টিম মেম্বার বলে চালিয়ে দেব। আসবি?”

শিল্পী সোৎসাহে বলল, “যাও না! চাকরীর বাইরে কিছুইতো কর না। আরিফ ভাইয়ের সাথে যোগ দিয়ে ভালো কিছু কর। মানুষের উপকার হবে।”

নীরবে মাথা নাড়ে সৌরভ। “ক’টায় তোর মিটিং?”

“সকাল দশটায়,” আরিফ বলল। “নয়টায় বেরিয়ে যাবো। সময় মত পৌঁছাতে হবে। পাত্তিওয়ালা মানুষ জন, একটু দেরী হলেই মনে করে গুরুত্ব দিচ্ছি না। যাবি?”

মাথা দোলায় সৌরভ। “যাবোখনে।”

আরোও কিছুক্ষন আড্ডা দিয়ে বিছানায় চলে যায় তারা।

পর দিন সকালে নিজের এলার্মের শব্দে ঘুম ভাঙল আরিফের। শনিবার। স্কুল ছুটি। বাচ্চারা দীর্ঘক্ষণ ঘুমাবে। শিল্পী আগেই জানিয়ে রেখেছে। সৌরভকে তুলতে হল। আটটার মধ্যে বাসা থেকে বের হতে হবে। আধ ঘন্টা আগেই প্রস্তুত আরিফ। ঠিক সময়ে হাজিরা দেয়াটা অসম্ভব জরুরী। সৌরভ সত্যিই আসবে সে আশা করে নি। কিন্তু আটটা বাজার দশ মিনিট বাকী থাকতেই দু’জনে সুট-প্যান্ট-টাই পরে যখন বাসা থেকে বের হচ্ছে, শিল্পী নিজের স্বামীর উপর থেকে দৃষ্টি সরাতে পারে না। এই লোকটাকে এই বেশে সে অনেক দিন দেখেনি। আরিফ ট্যাক্সি নিতে চেয়েছিল, সৌরভ মানা করেছে। সে নিজেই ড্রাইভ করবে।

গাড়ী স্টার্ট দেবার পরই সব কিছু মুহূর্তের মধ্যে গোলমাল পাকিয়ে গেল। আরিফ এই জাতীয় কোন কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সৌরভের চোখ উলটে গেল, মুখ দিয়ে গ্যাজা বের হতে শুরু করল, শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত হয়ে পড়ল। আসিফ ঘাবড়ে গিয়ে দ্রুত শিল্পীকে ডেকে নিয়ে এল। শিল্পী স্বামীকে কখনও এভাবে দেখেনি। তার নিজেরই মূর্চ্ছা যাবার দশা হল। আরিফ বিপদে পড়ল।

এমার্জেন্সী নাম্বারে ফোন করে এম্বুলেন্স পাঠাতে বলল সে। শিল্পীর দশা দেখে সৌরভকে একা রেখে চলে যাবার সাহস পেল না আরিফ। এম্বুলেন্স আসতে পনের দশ মিনিট গেল। মৃগী রোগীদের মত ছটফট করছে সৌরভ। বন্ধুর সাথে এমার্জেন্সীতে গেল আরিফ। চুলায় যাক ডোনার কন্সর্টিয়াম। আরিফকে ছাড়তে ছাড়তে বিকেল হল। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিছু পাওয়া গেল না। ধীরে ধীরে ভালো বোধ করতে শুরু করল সৌরভ। বাসায় ফিরে এল।

পর দিন। ফিরতি প্লেন ধরতে এয়ারপোর্টে এসেছে আরিফ, সৌরভ সঙ্গে এসেছে। বিদায়ের আগে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে অনুতপ্ত কন্ঠে বলল, "সরি দোস্ত। আমার জন্য তোর মিটিংটা মাটি হল।"

শ্রাগ করল আরিফ। "এটা কোন ব্যাপার না। আগামী মাসেই লন্ডনে আরেকটা আছে। দেখি ওখানে যেতে পারি কিনা। আমি বরং তোকে নিয়ে চিন্তিত। ইউনিভার্সিটিতে থাকতে তুই ছিলি সেরা স্পোর্টস্ম্যান। সবাই তোকে চিন্ত। তোর এইরকম অবস্থা হবে কে ভেবেছিল? ভালো করে ডাক্তার দেখাস। দেশে ফিরে গিয়ে আমি আমাদের বন্ধুদের মধ্যে বড় বড় ডাক্তার যারা আছে তাদের সাথে আলাপ করে দেখব। যা দেখলাম ভালো মনে হল না।"

সৌরভ থমকাল। "তুই দেশে ফিরে কারো সাথে এসব নিয়ে আলাপ করিস না, প্লিজ!"

অবাক হবার পালা আরিফের। "কেন রে? বাংলাদেশের ডাক্তার বলে অবহেলা করিস না।"

মাথা চুলকাল সৌরভ। ভাবছে। আরিফ সন্দিহান কন্ঠে বলল, "কি রে, কি ভাবছিস?"

অপরাধী মুখে তাকাল সৌরভ। "বন্ধু, তোর কাছে সত্যটাই বলি। আমার কোন অসুখ নাই। ব্যাপারটা একটু জটিল শোনাতে পারে কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশ ছেড়েছিলাম কারণ দেশে থাকতে এক হাজার একটা সমস্যা দেখতাম। এখানে এসে ঘর বাধার পর আমরা সবাই মিলে দেশের আলাপই করি – দেশের রাজনীতি, দেশের খাবার, দেশের আবহাওয়া। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার কিন্তু বাংলাদেশের ইজ্জত নিয়ে এখন আমি যতখানি চিন্তা করি, আগে কখন তার একাংশও করিনি। এই যে তুই এখানে এসেছিস দাতাদের কাছে গিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে দেশের দারিদ্রের কথা বলবি এটা শোনার পর থেকে আমার ভালো লাগছিল না। জানি তুই ভালো করার চেষ্টা করছিস কিন্তু এভাবে বিদেশীদের কাছে নিজেদেরকে বেইজ্জতী করাটা আমাকে কষ্ট দেয়।"

আরিফ হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। "তুই আমার মিটিংটা ভচকে দেবার জন্য এতো ঢং করেছিস?"

সৌরভ ম্লান মুখে বলল, "হ্যাঁ দোস্ত। মাফ করে দিস।"

আরিফ রাগ সামলাতে চেষ্টা করল, খুব একটা সফল হল না। সে চেক ইন গেটের দিকে গট গট করে হাঁটতে হাঁটতে বলল, “ভালো করিস নি কাজটা। দেশে গিয়ে বন্ধুদের সবাইকে ফোন করে বলব তুই কেমন ধুমসো মৃগী রোগী হয়েছিস! বেইজ্জতীর দেখেছিস কি?”